ইন্দ্রিয়সংবেদন, প্রত্যভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞতালোক

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনে হয়ত অবাক হবেন, বাংলা অভিধানে 'অভিজ্ঞতা' শব্দটার কোনো স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না; এমনকি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মর্যাদাও তাকে দেওয়া হয়নি। অভিধানে যা পাওয়া যায়, তার নিত্তি-নির্দেশ এইরকম কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞান যিনি অর্জন করেছেন, তিনি হলেন অভিজ্ঞ; আর তাঁর সেই বিশেষ গুণটির নাম অভিজ্ঞতা। এই ধরনের অর্থ বিচারে অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানসঞ্চয়ের একটি পন্থা বা প্রকরণ হিসাবেই কেবল চিহ্নিত করা হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস যেমন বলেছেন, 'অনেক দর্শন ও শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান জন্মে' তা-ই হল অভিজ্ঞতা।

কিন্তু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমরা তো কেবল নতুন জ্ঞানই সঞ্চয় করি না; পুরনো জ্ঞানকে একবার যাচিয়েও দেখি। তত্ত্ব বা তথ্য হিসাবে যা জেনেছিলাম কোনো পরোক্ষ সূত্র থেকে, তাকে এবার বিচার করি প্রত্যক্ষতার নিরিখে। সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা তখন হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা প্রক্রিয়া, যাব ভেতর দিয়ে আমাদের জ্ঞানের জগতে একটা ভাঙাগড়া চলতে থাকে; অনেক পুরনো ধারণা, বিশ্বাস ভেঙে পড়ে; আবার তৈরি হয়ে ওঠে জ্ঞানের নতুন প্রকার - গড়েও নতুন কোনো-এক প্রত্যয় বা কনসেপ্ট। পুরনো ধারণাটা যদি ঠিক বলেও প্রমাণিত হয়, তাহলেও কিন্তু অভিজ্ঞতাটা অবান্তর হয়ে যায় না। কারণ প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানে নতুন স্তর বা মাত্রা আসে। পুর্বার্জিত ধারণাকে আমরা তখন উপলব্ধি করি নতুন এক অবয়বরূপে।

কিন্তু অভিজ্ঞতার তত্ত্বকথা বলার জন্য তো এ-লেখা নয়; অভিজ্ঞতা ব্যাপারটাকে আমরা কীভাবে বুঝতে চাইছি, সেই বিষয়ে দু-একটা প্রাথমিক কথা শুধু গোড়াতে বলে নিতে চাই। নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে ঠিকই; কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি করে দিয়েছে । আমাদের বীজ --- তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল ওইটুকুই; কিন্তু ওই বীজের ভেতরেই যে নিহিত আছে প্রকৃত সত্তা -- এই পরম জ্ঞানটি তিনি পেলেন উদ্দালকের মুখ থেকে শুনে। প্রত্যক্ষের সঙ্গে তাহলে যুক্ত হল আর একটি সূত্র প্রাজ্ঞ বচন বা আর্যবাক্য --- প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'শব্দপ্রমাণ'। প্রত্যক্ষ, অনুমান আর শব্দ --- জ্ঞান অর্জনের এই হল তিনটি উপায়।

এ-সবই অবশ্য বই পড়ে জানা। পড়েছি উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। এখন এই পড়ে জানাটাকেও তো একটা অভিজ্ঞতাই বলতে হয়। না পড়লে এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম; অতএব জানাটাও হত না। আবার অনুমানের কথা যদি ভাবি, তার পিছনেও তো পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার একটি প্রবর্তনা রয়ে গেছে। পূর্ব অভিজ্ঞতাই তো আমাকে প্রণোদিত করছে অনুমানের দিকে। অনুমানকেই বা তাহলে অভিজ্ঞতা থেকে বিযুক্ত করি কেমন করে? অভিজ্ঞতা মানে কি শুধুই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা? আরও কত সূত্র থেকেই তো আমরা কত কিছু জানতে পারি। সেই সব কিছু নিয়েই তো গড়ে ওঠে আমাদের অভিজ্ঞতার ভুবন। বুদ্ধদেব বসু একবার লিখেছিলেন, ইন্দ্রিয়-সংবেদন যখন 'আধ্যাত্মিক সামগ্রী'-তে পরিণত হয়, তাকে আমরা বলি অভিজ্ঞতা। ধরে নিচ্ছি, 'আধ্যাত্মিক' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন কোনো উন্নততর বোধের কথা। অভিজ্ঞতা শব্দটাকে আমরা এখানে গ্রহণ করছি এই রকম এক বিস্তৃত অর্থেই।

লিখতে হবে অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু কোন্ অভিজ্ঞতা? প্রতিদিনই তো জীবন ভরে উঠছে কত বিচিত্র বিবিধ অভিজ্ঞতায়। প্রত্যেকের জীবনই তো আসলে অভিজ্ঞতার উপন্যাস-- কে কার গল্প শোনে। আর শোনাতে হবেই বা কেন? আমরা অভিজ্ঞতায় যা পেয়েছি, তা-ই অদ্বয় সত্য ---এমন কথা তো বলা যায় না । কিন্তু তবু যে আমরা অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখি, অপরকে ডেকে শোনাই --- তা কেবল আত্মরচিত নয়। অভিজ্ঞতার জগৎ যে সবসময়েই পরিসীমিত, স্থান কাল আর ব্যক্তির জীবনচর্যার গন্ডিতে বাঁধা --- তা আমরা সবাই জানি। তবু তার ভেতরেই সত্যের একটা খন্ডাংশ, একটা চূর্ণ সত্যের আভাসও থাকতে পারে। আমাদের সেই উপলব্ধির সত্যটাকেই আমরা ভাগ করে নিতে চাই পরস্পরের অন্তরালাপে; এই বিশ্বাসে যে, আমার অভিজ্ঞতা আর -- একজনের মনে নিশ্চিত সত্য না হোক, নতুন এক উপলব্ধির উদ্দীপন অন্তত হয়ে উঠতে পারে ।

আর সেই উপলব্ধিটুকু নিয়েই তো বাঁচা।

আমি প্রথমে বলব এমন এক অভিজ্ঞতার কথা, যা আমার পূর্বার্জিত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে। শ্রমিকদের ভেতর একটা শ্রেণীগত ঐক্য থাকে --- এটা ছিল আমার বইপড়া জ্ঞান। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সেই সত্যকে কিন্তু আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর পাইনি। এক কারখানার শ্রমিক আর এক কারখানার গল্পটাও যেন ভালো করে শুনতে চান না। আমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটা খুবই ছোটো; দ্বিতীয়ত, ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে এই কাজ যখন করছিলাম, পশ্চিমবাংলার শ্রমিক আন্দোলনে তখনই একটা নৈরাশ্য, একটা বদ্ধভাব এসে গেছে। শ্রমিকরা কোনো ইউনিয়নকেই বিশ্বাস করেন না; কোনো মতাদর্শেই তাঁদের আস্থা নেই।

আমরা এই উপলব্ধিরই এক দৃশ্যরূপ দেখতে পেয়েছিলাম ১৯৯৩ সালে হুগলির একটা জুটমিলে গিয়ে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর ছবি ভেঙেছে; আবার চূর্ণ হয়েছে লেনিনের প্রতিকৃতিও। এর অল্প কিছুদিন পরেই কানোরিয়া জুটমিলের আন্দোলন যখন প্রায় একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে, তখনও কিন্তু অবস্থাটা খুব বদলায়নি। সংগ্রামী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু শিল্পীসাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবী আর ছোটো সংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা। সেই আন্দোলন অন্য কারখানার শ্রমিকদের খুব বেশি কাছে টানতে পারে নি। কিছু শ্রমিক নিশ্চয়ই কোনো-না- কোন মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন; সাহায্য তহবিলে টাকাও দিয়েছিলেন কেউ কেউ; কিন্তু শ্রমিক ঐক্য বলতে আমরা যেমন ভেবে থাকি, তেমন আদর্শপ্রাণিত কোন সহমর্মিতার প্রকাশ বিশেষ দেখা যায়নি। কানোরিয়ার সমর্থনে কোন শিল্পধর্মঘট হয়নি এই রাজ্যে।

এখন এই অভিজ্ঞতার কথাটা যদি আমাকে লিখতে হয়, আমি তাকে কোথায় কীভাবে স্থাপন করব? আমি নিশ্চয়ই একথা বলতে পারি না যে, শ্রমিক ঐক্যের ধারাটাই একটা মিথ। অথচ আমার অভিজ্ঞতাটাও তো আমার কাছে নিরর্থক হয়ে যেতে পারে না। আমাকে তাহলে লিখতে হবে পূর্বাজিত ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাপ্তিকে মিলিয়েই। এর ফলে সেই লেখায় উপলব্ধির এমন একটা মাত্রা হয়ত আসতে পারে, যা আমি ওই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে না গেলে অর্জন করতে পারতাম না।

বই-পড়া জ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখে পড়ে কেমন টাল খেয়ে যায়, তার আর একটি কাহিনী এবার শোনাতে পারি। শিক্ষাতত্ত্ব আর তার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিহাস পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ এই প্রচলিত শিক্ষাটা আসলে কেউ-ই চায় না। শিক্ষার অন্য এক প্রকরণ যদি মানুষের সামনে উপস্থিত করা হয়, তাহলে তা সাদরে গৃহীত হবে এবং এইভাবে আমরা এক অনুকল্প শিক্ষারধারণা গড়ে তুলতে পারব। অবহেলিত শিশু আর নারীদের সঙ্গে টানা আট বছর এই কাজ করে এখন কিন্তু আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমরা যে বিকল্প শিক্ষার কথা ভাবি, তা শেষ পর্যন্ত মানুষকে অ

াকর্ষণ করতে পারে না। একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষার যে কাঠামো দুশো-তিনশো বছর ধরে গড়ে উঠেছে, মানুষের মনের ওপর তার প্রভাব অপরিসীম। যে লোক কখনো স্কুলে যায় নি, সে-ও শিক্ষা বলতে বোঝে একটা ইস্কুলবাড়ি --- যেখানে ঠিক সময় ঘন্টা পড়ে, মোটা বই পড়ানো হয়, খাতা ভর্তি করে লেখানো হয় এবং বছর শেষে পরীক্ষার পর কেউ পাস করে কেউ বা ফেল হয়ে যায়।

এই কাঠামোটাকে ভাঙার যে প্রয়াস, তাকে মানুষ দূর থেকে প্রশংসা করে, কিন্তু অন্তর থেকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তাই আমাদের উদ্‌ভাবনাকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, কিন্তু শিক্ষা বলে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁদের মনে হয়েছে, এটা যেন ঠিক পড়া নয় --- পড়া-পড়া খেলা। সমস্যাটা ভালো করে বুঝতে পারি সাক্ষরতার কাজ করতে গিয়ে। সেকেলে বর্ণপরিচয়ের পদ্ধতি ত্যাগ করে আমরা শু করতে চেয়েছিলাম পূর্ণশব্দ দিয়ে --- সাক্ষরতা বিজ্ঞানে যাকে বলে হোল ওয়র্ড অ্যাপ্রোচ। এই পদ্ধতিতে সাক্ষরতা ব্যাপারটা কেবল অক্ষর-পরিচয় আর শব্দের বানান মুখস্থ করার ক্লান্তিকর অনুশীলন হয়ে থাকে না। একটা গোটা শব্দকে চেনা হয় কোনো একটি বস্তু বা বিষয়ের প্রতীক হিসাবে এবং তার প্রতিবেশ বা কনটেক্সটএর সাপেক্ষে। এই পদ্ধতি সে হিসাবে অনেক বেশি অর্থময়। একটা শব্দ পড়তে বা লিখতে পারার ভেতর এখানে একটা সৃজনের ব্যাপার থেকে যায়।

শিশুরা এই পদ্ধতিতে নিচয়ই কিছু শিখেছে, আনন্দও পেয়েছে; কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের আর বাবা মায়েদেরও মনে হয়েছে, বর্ণ পরিচয় দিয়ে শু করলেই যে ভালো হত। আমরা ছবি দেখিয়ে, গল্প বলে একটা প্রতিবেশ রচনা করে তার ভেতর থেকে দুতিনটি প্রাসঙ্গিত শব্দ হয়ত একদিনে শেখাতে পারতাম। কিন্তু অভিভাবকদের ধারণা হল এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট শেখা হচ্ছে না। তাঁদের দাবি ছেলেমেয়েদের রোজ বানান লিখতে দেওয়া হোক, নিয়ম করে বানান মুখস্থ করানো হোক -- তবেই না লেখাপড়া।

বয়স্কা নারীদের সঙ্গে কতাজ করতে গিয়েও আমাদের প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। যে শব্দগুলোর অর্থ তাঁদের জানা নেই, যেগুলি তাঁরা কোনদিনই ব্যবহার করেন না, সেই রকম 'কঠিন-কঠিন' শব্দের বানান মুখস্থ করতে দিলেই তাঁরা খুশি হন; মনে হয়, অনেকটা যেন শেখা হল। একটা শব্দ শেখা মানে যে শুধু তার বানান মুখস্থ করা নয় --- এটা আমরা বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। লেখার ক্ষেত্রে দেখিয়েছি, ধবনির চিহ্ গেঁথে গেঁথে আমরা কেমন করে একটা শব্দ গড়ে তুলি। তাঁরা কিছুদিন আগ্রহ দেখিয়েছেন; ধরতেও পেরেছেন খানিকটা; কিন্তু তার পরই তাঁদের মনে হয়েছে; বানান লেখানো হচ্ছে না কেন? তাঁরা চান কৃপ-নৃপ। তৈজস বৈজস ---এই সব শক্ত শক্ত শব্দের বানান খাতা ভর্তি করে লিখে নিয়ে যেতে।

এই পর্যন্ত পড়ে পাঠকের হয়ত মনে হতে পারে, আমি কেবল হতাশা আর ব্যর্থতার কথাই বলে যাচ্ছি। এই ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনী শুনে লাভটাই বা কী? ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। সমস্য বা সংকটের কথাটাই আগে বলছি, কারণ সেটাই আমাদের বেশি কষ্ট দেয়; যেকোনো কাজে সেটাই হয়ে ওঠে উদ্বেগ আর চিন্তার প্রধান বিষয়। অন্য ধরনের অভিজ্ঞতাও নিচয়ই আছে। অভিজ্ঞতায় পাবার আগেই যাকে সত্য বলে জেনেছিলাম, তাকেই আবার সত্য হয়ে উঠতে দেখেছি অভিজ্ঞতার সংবেদনে। তবে যে আকারে ভাবা গিয়েছিল, ঠিক সেই আকারে হয়ত নয়।

শ্রমিক ঐক্যের কথাটাই আগে বলি। অর্চনা গুহ মামলার রায় যেদিন বেরোয়, আদলত প্রাঙ্গণে এক চায়ের দোকানি আমাদের বিনে পয়সায় তা খাইয়ে দিলেন। তিনি জানতেন, আমরা কয়েকজন মামলার দিনে মাঝে মাঝে আদালতে উপস্থিত থাকি। আজ সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। অন্যায় পরিকীর্ণ এই জীবনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্তত একটি ক্ষেত্রে। ন্যায় আর সত্যের সেই বিজয়োৎসবে তিনিও যোগ দিতে চান সামান্য সম্বল নিয়ে।

উত্তর চবিবশ পরগণার কামারহাটিতে বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা কারখানা বহুকাল ধরে হয়ে আছে। শ্রমিকরা সেখানে প্রতিরোধের একটি অসাধরণ দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন এইভাবে, তাঁরা রোজ পালা করে কারখানাটা পাহারা দিতেন, যাতে মালিক যন্ত্রপাতি বিত্রি করে দিতে না পারে। পাহারা তো দেবেন সারাদিন রাত, কিন্তু খাবেন কী? শ্রমিকরা রোজ সকালে একটা চাদের নিয়ে বাজারে যেতেন; কেউ একমুঠো চাল, কেউ দুটো আলু দিয়ে সাহায্য করতেন। আদালতের সেই চায়ের দোকানি বা বাজারের ব্যাপারিরাও অর্থে শ্রমিকই। অন্যায়ের বিদ্ধে সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সমবেদনা তাঁরা জ্ঞাপন করছেন এই ভাবে; ঝান্ডা উড়িয়ে নয়, মিছিলে যোগ দিয়ে বা রাস্তা অবরোধ করে নয় --- তাঁদের সামান্য সাহায্যটুকু জুগিয়ে দিয়ে। মার্কস - লেনিনের বইতে যেমন পড়েছি, ঠিক সেই আকারে হয়ত নয়, কিন্তু সেই শ্রমিক ঐক্যেরই তো প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি আর একভাবে।

শিক্ষা নিয়ে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতার মধ্যেও এমন কিছু মুহূর্ত এসেছে, যা চিরদিন মনে রাখার মতো। একটা শব্দ শেখার পর আমাদের বোঝার বিষয় হত একই শব্দকে আমরা কতরকম ভাবে ব্যবহার করি আর তার ফলে কত ধরনের অর্থই না নির্মিত হতে থাকে একটি শব্দ থেকে। বয়স্কা নারীরা এটা খুবই উপভোগ করতেন; এই পদ্ধতির নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'খুঁটে খুঁটে পড়া'। একবার একটি শব্দ শিখিয়েই দ্রুত আর একটি শব্দে আর একটি শব্দে চলে যাচ্ছি দেখে একজন বলে ইঠলেন, 'কই, আপনি সেভাবে পড়ালেন না তো?'

------ কীভাবে?
------ ওই আপনি যেমন পড়ান ----- খুঁটে খুঁটে। .....

এই 'খুঁটে খুঁটে' শব্দটা এখানে যেভাবে ব্যবহার হল, তা কোনো অভিধানে পাওয়া যাবে না; কারণ এই শব্দবন্ধের জন্ম হয়েছে এইমাত্র---একটা বিশেষ অভিজ্ঞতার অন্তর্লোক থেকে।

আমরা গল্প পড়ি, আবার কবিতাও পড়ি। দুটোর মধ্যে তফাত কোথায়? আমাদের বয়স্ক ছাত্রী বুঝিয়ে দিলেন, কবিতায় একটা বেশ টান থাকে --- একটা লাইন থেকে আর একটা লাইনে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। আর একজন নারী কথাপ্রসঙ্গে জানালেন তাঁর ছেলে একটা খাবারের দোকানে কাজ পেয়েছে। খুবই আনন্দের খবর। তাঁকে বলি, লিখুন তো, আপনার ছেলে কী কাজ করে। তিনি স্বচ্ছন্দে লিখে দেন, ছেলে 'চাউমিনে কাজ করে।'

মুখের ভাষা বা ওর‍্যাল ল্যাংগুয়েজ নিয়ে কিছু পড়াশোনা আগেই করা ছিল। সেই ভাষারই এক চমৎকার প্রকাশ এবার পেয়ে যাই অভিজ্ঞতার ভেতরে। লক্ষ্য করি, কোন বিষয়টা যে ছাত্রীদের মনে ধরবে, তা আগে ছাকতে কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। আমরা যারা স্কুল-কলেজে পড়েছি, তারা জ্ঞান বলতে যা বুঝি, অনক্ষর বা সদ্য-স্বাক্ষর সমাজের ধারণা তার থেকে স্পষ্টত পৃথক। বিদ্যালয় বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে 'কী - কেন' জানতে হবে --- কার্যকারণ সম্পর্কটা বুঝতে হবে। যারা ইস্কুলে পড়ে নি, তাদের চেতনায় জ্ঞানের ধারণাটা কিন্তু ঠিক এ-রকম নয়। একবার এক মেঘলা গুমোট দিনে আমরা আলোচনা করেছিলাম, আকাশে মেঘ থাকলে গুমোট লাগে কেন? ছাত্রীরা মন দিয়েই শুনেছিলেন; কিন্তু তাঁদের খুব যে ভালো লেগেছিল মনে হয়নি। মাটির কলসিতে জল ঠান্ডা হয় কেন? ---- এ প্রশ্নের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই আমাদের ছাত্রীরা শুনতে রাজি হননি। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য হল মাটি সব সময়েই ঠান্ডা। মাটির জিনিসে জল রাখলে তাই ঠান্ডা থাকবে। এ আবার বোঝার কী আছে ! পরে ভেবে বুঝেছি, তাদের এই প্রতিত্রিয়ার কারণ কিন্তু নিছক কোনো অনীহা বা অনাগ্রহা নয়।

স্পর্শের সংবেদন, অনুভূতির ভেতর দিয়ে যা জেনেছি, তাকে আবার ভেঙে বিশ্লেষ করে বুঝতে হবে --- এ হল বিজ্ঞানের কথা, যা আমরা পাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জ্ঞানতত্ত্ব থেকে। সেই শিক্ষার অভিজ্ঞতা যাদের নেই, তাদের বোঝার ধরনটা

কিছু অন্য রকম। এসব কথা তত্ত্বে আগে পড়েছিলাম। কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা সত্যিই মিলে যাচ্ছে। আমরা যাকে ইতিহাসের কালচেতনা বলি, সেটাও আমরা পাই প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার দৌলতে । সে শিক্ষা যঁারা পাননি, তাদের সময়চেতনার এক পৃথক ধরন আছে --- সময় সেখানে বিভক্ত দুটি ভাগে পুরনো কাল (অতীত) আর এখলকার কাল (বর্তমান)। অতীতের ভেতরেও যে আবার নানা পর্ব আছে, সেটা তাদের কাছে গণণীয় নয়।

ছোটো ছেলেমেয়েরা আমাদের মুখে মহেঞ্জোদড়ো আর হরপ্পার গল্প শুনে জানতে চেয়েছিল, সেখানে স্কুল ছিল কি? --- তাদের দিক থেকে এটা খুবই সংগত প্রশ্ন। এত বড় দুটো নগরের গল্প শোনা হল --- সেখানে কত কী ছিল আর স্কুল থাকবে না। অনেক পুরনো দিনের ইতিহাস আমরা জানতে পারি মাটি খুঁড়ে পাওয়া নানা রকম নির্দশন থেকে। এই গল্প শুনিয়ে আমরা সেই শিশুদের বলেছিলাম, বেথুন কলেজের মাঠে এখন খোঁড়াখুঁড়ি চলছে --- সেখানে থেকেও অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর পরই আমরা জানতে চাই, সেখানে থেকে কী কী জিনিস পাওয়া যেতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়? কেউ বলে, মূর্তি; কেউ বলে, ভাঙা ইট, মাটির পাত্র। তারপর একটি ছেলে গম্ভীরমুখে জানায়, চক-ডাস্টার ও পাওয়া যেতে পারে। জায়গাটা যখন কলেজ, তার মাটির নিচে চক-ডাস্টার থাকবে না, তাই কী হয় !

আপাতভাবে যাকে কালানৌচিত্য দোষ মনে হচ্ছে, তা কিন্তু নিছক সময়বিভ্রাট নয়। তাদের চিন্তার গঠনেরই এক বিশিষ্ট রূপ বলা যেতে পারে একে। সেই চিন্তার প্রকরণে বর্তমান প্রক্ষিপ্ত হয় অতীতে --- কোনো একটা বিষয়কে বুঝতে চাওয়া হয় কোন প্রত্যক্ষতার নিরিখে। শহর বললেই তাই তারা বুঝে নেয়, এমন এক জায়গা, যেখানে অফিস আছে, স্কুল-হাসপাতাল আছে। এমনকি পুলিশের 'হাল্‌লা গাড়ি'ও আছে। বয়স্ক নারীদের সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি, সময়কে তাঁরা ঠিক সালতারিখ ধরে হিসাবে করতে চান না। 'সে কত কাল আগে কেউ জানে না' --- এই হল তাদের সুচিন্তিত অভিমত।

সুন্দরবনের আদিবাসী ওরা, ওঁদের এক সময় ছোটনাগপুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল জমি হাসিলের কাজে। তারপর থেকে সেখানেই রয়ে গেছেন। তাঁদের আদি বাসভূমির নাম তাঁরা শুনেছেন, পুজোপরবে 'নাগপুর'কে একবার স্মরণ করে নেওয়া রীতিও আছে। কিন্তু ঠিক কবে তাঁরা সুদুর বিহার থেকে প্রান্ত দক্ষিণবঙ্গে চলে এলেন --- ইতিহাসের সেই সময়কালটাকে তাঁরা অত গুত্ব দিতে চান না। আমরা যত বারই করিয়ে দিই, তাঁরা ভুলে যান। একদিন একজন তো বেশ বিরক্ত হয়েই বলেন,'কত কাল ধরে মানুষের আনাগোনা চলছে --- তার কি কোন হিসেব আছে।'

পরে তাঁর ওই প্রতিত্রিয়াটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গিয়েছিল জিম করবেটের এক অভিজ্ঞতার কথা। দ্রপ্রয়াগের সেই ভয়ানক মানুষখেকোটাকে করবেট যখন হন্যে হয়ে খুঁজছেন, সেই সময় একদিন আবির্ভূত হলেন এক সাধুমহারাজ। তিনি জানালেন, একটি যজ্ঞ সম্পাদন করলেই গ্রামটি ব্যাঘ্রের কবল মুক্ত হতে পারে। সাধু ঘোষণা করলেন, গভীর রাত্রে তিনি একাকী যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। গ্রামের লোকেরা তা মেনে নিল এবং পরের দিন সকালে দেখা গেল, যজ্ঞানুষ্ঠানের কিছু চিহ পড়ে আছে, কিন্তু সাধু অন্তর্হিত হয়েছেন। এরপর জিম করবেট যখন গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেন, সাধু কোথায় গেছেন? তারা গভীর দার্শনিক প্রতীতি সহকারে সাহেবকে বোঝাল, ভারতের সাধু ঋষিরা কোথা থেকে আসেন। কোথায় চলে যান --তা কেউ বলতে পারে না

আমাদের আদিবাসী ছাত্রী, সেই নারীও যেন একইভাবে বলতে চেয়েছিলেন, সময়কে ঠিক বছর বা দশক ধরে পরিমাপ করা যায় না। মানুষের অভিবাসন--- এ তো যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আদিবাসীদের ডেকে আনা হয় জঙ্গল কাটার মতো শ্রমসাধ্য কাজটা নেওয়ার জন্য। তারপর চাষের জমি তৈরি হয়ে গেলে তাদের ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ---উনিশ শতকের বাংলায় কৃষিবিস্তারের ইতিহাসটাই তো তাই। আমরা দলিল-দস্তাবেজ ধেঁটে যা জেনেঠি, তাঁদের জীবনে তা অভিজ্ঞতার সত্য হয়ে আছে। যে, আদিবাসীদের কথা বলছি, তাঁরা এক সময় বিহার থেকে নেমে এসেছিলেন দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলে। তারপর একদল সেখানে থেকে ভূমিচ্যুত হয়ে উঠে এসেছেন কলকাতার আশেপ

াশে। সেই রকমই এক জায়গা, গড়িয়ায় বসে আমরা এখন শুনছি তাঁদের গল্প।

আর একদিন এক নারী দুঃখ করে জানালেন, আগে তাদের কত জমি ছিল, এখন 'পার্টির লোকেরা' সব 'ভেস্ট' করে নিয়েছে।

জানতে চাই, ভেস্ট মানে কী?

তিনি বুঝিয়ে বলেন, ওই খাস করে নিল আর কী?

---- তার মানে?

---- মানে কেড়েকুড়ে নিল।. . .

জমিদারি অধিগ্রহণ আইন প্রবর্তি ত হয়েছে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। আইনের কেতাবে তার নীতি-নির্দেশগুলোকে একভ াবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু গ্রামের মানুষের আছে এক নিজস্ব সংহিতা, সেখানে সরকার মানে হল 'পার্টি'; আর 'ভেস্ট' করে নেওয়ার অর্থ 'কেড়েকুড়ে নেওয়া'। মহামান্য কোনো নেতা এখন গম্ভীরমুখে বলতে পারেন, এ হল অশিক্ষার ফল --- - সাক্ষরতার হার বাড়াতে হবে। আমাদের কিন্তু তা মোটেই মনে হয়নি। পথবাসী শিশুরা যে অতীতের মধ্যেও আবার দূরনিকট ভাগ করতে চায়নি, তার কারণ অতীতে বলতে তারা যা জানে সেই অতীতের মধ্যেও যে আবার ভাগ আছে, নিরবধি কালকে যে আবার খন্ডে- খন্ডে পর্বে - পর্বে ভাগ করে বিচার করতে হয়, এই চিন্তাটাই তাদের কাছে অদ্ভূত বলে মনে হয়েছিল। ঠিক তেমনি আমাদের ওই আদিবাসী ছাত্রী 'পার্টি' আর 'ভেস্ট' শব্দ দুটোকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, ত া তাঁর নিজস্ব নির্মাণ; এখানে অর্থ এসেছে অভিধান থেকে নয়। আইনের পুস্তক থেকে নয়; তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞত া, উপলব্ধির চিন্তাচেতনা আর স্বানুভূতি --- দর্শনের ভাষায় যাকে বলে 'লাইফ ওয়র্ল্ড' ---- সেই চিত্তবিশ্বের ভেতর থেকে।

শিক্ষার বিষয়টা স্থির হবে প্রতিবেশের নিরিখে, পাঠক্রম হবে জীবনযাপনের সংশ্লিষ্ট --- কনটেক্সট --- স্পেসিফিক। এসবই ছিল পুঁথিজ্ঞান। কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, তত্ত্বটা ঠিকই; তবে তা ব্যবহার করতে হয় খুবই সতর্কভাবে। মানুষ --- বিশেষত দারিদ্রপীড়িত মানুষ --- যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চায় না। জীবন সেখানে নিত্য অবমান, মানুষ সেখানে স্বপ্ন বা কল্পনালোকে একটু মুক্তি খুঁজতে চায় দৈনন্দিনের গ্লানি থেকে। দলিত ছাত্রদের সঙ্গে জ াতপাত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, একটা স্তরের পর তারা আর শুনতে চাইছে না। আদিবাসী নারীদের জন্য আমরা তৈরী করেছিলাম, তাঁদের ইতিহাস, পুরাণ আর সংস্কৃতি নিয়ে ছোটো ছোটো টেক্সট। কয়েকদিন বেশ জমল। ত ারপরই কিন্তু তাঁদের মলে হল এ আর কী শুনব! সেই একই সংকট। অস্তিত্বের যে পরিবেষ্টনটা জীবনকে ঘিরে আছে, তা যে আবার আলোচনার বিষয় হতে পারে, এটা তাঁরা কিছুতেই মানতে চান না।

অথচ মজা হল, আলোচনা শু করলেই দেখা যায়, প্রতিবেশ বারবারই উঠে আসছে কথার ভেতর থেকে। তারা যা বলছেন, তার অনেকটাই হল দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির কথা। কিন্তু সেটাও যে শেখার, জানার বিষয় হতে প ারে এটা তাঁরা মানতে রাজি নন। মনস্তত্ত্বের এই ব্যাসকূট বুঝতেই কিছুদিন সময় লেগে যায় আমাদের। আর তারপরই অ াশর্চ্য সব উপলব্ধি আর অভিজ্ঞকার টুকরো টুকরো আখ্যান উৎসারিত হতে থাকে কথালাপের ভেতর দিয়ে। পথবাসী শিশুদের জন্য আমরা একটা আলোচনার বিষয় রেখেছিলাম পুলিশ আর জনসাধারণ --- পুলিশ কী করতে পারে, আর কী পারে না, জনসাধারণের কী কী অধিকার আর কর্তব্য আছে--- এই সব। বেশ কয়েকদিন চলেছিল এই আলোচনা। ত ারপর একদিন একটি ছেলে যা বলে, শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। ছেলেটি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, যা বলা হচ্ছে, ত

া সবই ঠিক; কিন্তু 'আমরা তো জানি যে রাস্তা দখল করে আমরা বে-আইনি কাজ করছি; তাহলে আমরা অধিকারের কথা বলব কোন্ মুখে!'

সেই কিশোর ছেলেটি ঠিক কী ভেবে এই কথা বলেছিল, আমরা জানি না; তবে তার সেদিনের সেই উক্তি থেকে আমরা অন্তত অনেক কিছু শিখেছিলাম। আমরা যারা মোটামুটি সুরক্ষিত - সুস্থিত জীবনে লগ্ন, তারা নাগরিক বা মানবিক অধিকারের চর্চা করি একভাবে। কিন্তু যাদের অস্তিত্বটাই অনিশ্চিত এবং বিপদসংকুল, কিছু আইনবিদ্ধ কাজ যাদের করতে হয় বা তার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত থাকতে হয়, তাদের চেতনায় 'অধিকার' শব্দটার লক্ষণার্থ ভিন্নতর। নিজেদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তারা জানে, অধিকারগুলো আইনের কেতাবে মুদ্রিত কিছু গম্ভীর শব্দ, যাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না। প্রতিদিনের জীবন তাদের বাঁচতে হয় পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, প্রয়োজনে টাকা দিয়ে কিনে নিতে হয় কয়েকদিনের সাময়িক নিরাপত্তা।

পাঠ্যবিষয়কে বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে অন্তরালাপের একটা বাতাবরণ আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম বলেই তাদের সত্তাদর্শন এইভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পেল। তা নাকরে আমরা যদি সরকারি পাঠ্য বই ধরে এই মহান গণতান্ত্রিক দেশ আর তার নানাবিধ অধিকারের মহিমাকীর্তন করে যেতাম, আমাদের ছাত্ররা চুপচাপ শুনে যেত, কিন্তু একটি বর্ণও বিশ্বাস করত না।

আদিবাসী ছাত্রীদের নিয়েও আমাদের নানা চমৎকার অভিজ্ঞতা আছে। একদিন আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে কেমন যুবক -যুবতীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসের ব্যবস্থা আছে --- ওরাও সমাজে তার নাম 'ধুমুকুড়িয়া' ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র রায়ের বই তো আগেই পড়া ছিল; এবার সেই বিদ্যে ফলিয়ে তৈরি করা হয়েছিল একটি ছোটো টেক্সট। কিন্তু একটুখানি পড়ার পরই লক্ষ্য করি, এক নারীর মুখে হাসির উদ্ভাস, একটু যেন কৌতুকও মিশে আছে তার সঙ্গে। এরপর তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না; হাসতে থাকেন খিলখিলিয়েই। জানতে চাই, হাসির করণটা কী। তখন তিনি একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, জানেন তো ছোটোবেলায় খুব দাপাদাপি করলে মা বলত, ব্যাপারটা কীরে ধুমকুড়ি পেয়েছিস নাকি! তখন তো মানে জানতাম না; এখন বুঝতে পারছি। . . . সেদিন সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, লেখাপড়া কতটা হল জানি না। তবে সেদিনের সেই পাঠ্যবিষয় থেকে যা পাওয়ার ছিল, পাওয়া হয়ে গেছে।

ভেরিয়ার এলউইন লক্ষ্য করেছিলেন, আদিবাসীরা একটা গাছকে কখনও নিখুঁত সোজা করে আঁকে না। তাদের বক্তব্য হল গাছ কি কখনও টানা সোজা উঠে যায়? ঠিক একই ধরনের উপলব্ধি আমাদের হয় যখন এক আদিবাসী নারী আমাদের একটি গাছের ছবি এঁকে দেন। কথায় কথায় আমরা জেনেছিলাম, সরহুল বা সাল উৎসবের দিনে তাঁরা ঘরের দেওয়ালে ছবি এঁকে রাখেন। অনুরোধ, আমাকে একটা ছবি এঁকে দিন। ফুলন্ত গাছের যে ছবিটা তিনি এঁকে দেন, সেখানে গাছটার গোড়াসুদ্ধ দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি, গোড়াটা আঁকলেন কেন? --- সেই নারী প্রথমে বিস্মিত, তারপর আমাকে ধমক দিয়েই যেন বলে ওঠন, গোড়া ছাড়া গাঠ হয়, দেখেছেন কখনও?

সত্যিই তো, আমরা যখন গাছকে দেখি, তার গোড়া বা মূলের অংশটা আমাদের দৃষ্টির ফ্রেমে ধরা পড়ে না। তাই গাছকে আমরা মূল বাদ দিয়েই আঁকি। চোখে যেমন দেখছি, সেই রকম। কিন্তু এই নারী আঁকছেন শুধু গাছ নয়, গাছের পুরো আইডিয়াটা --- তাই মূলসুদ্ধ পুরো গাছটাই এসে গেছে ছবিতে। মধুবনি চিত্রকলাতেও এরকম দেখেছি।

মানুষ কত রকমভাবে জগৎ-জীবনকে দেখে, চিন্তার ছাপ কেমন বদলে বদলে যায়, আর সেই সঙ্গে বদলাতে থাকে দেখার দর্শনও --- সেই অন্তর্প্রক্রিয়াটা আমরা কিছুটা ধরতে পারি এই রকম অন্তরালাপের ভেতর দিয়েই। অন্যের অভিজ্ঞতার কথা পড়ে বা শুনেও নিচয়ই অনেক কিছু জানা যায়, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপের একটা অতিরিক্তপ্রাপ্তি থাকে; সেখানে কথার

সঙ্গে আসে অনুকথা; গল্পের সঙ্গে মিশে যায় জল্পনাও --- তার ভেতরেও আবার আর একটা গল্প থাকে।

সময়ের কথা হচ্ছিল। এই একই সময়কাল আমরা এতজন মানুষ একসঙ্গে বাস করছি। কিন্তু সকলেই কি একই সময়ের শরিক? কথা বললেও বোঝা যায় প্রত্যেকরই যেন একটা নিজস্ব সময়বৃত্ত আছে --- তার ভেতরেই তিনি বাস করেন। সেই সময়টা পঞ্চাশ বছর পিছোনো হতে পারে একটি, আবার দশ-বিশ বছর এগিয়েও থাকতে পারে কিংবা তা হতে পারে এমন একটি কালখন্ড যার তেমন লয় নেই, ক্ষয় নেই। সমকালটা হল সময়ের উপরিতল; আর তার অন্তরপ্রদেশে রয়ে গেছে আর এক কালব্বি। অভিজ্ঞতাই হল সেইযেখানে আমরা সময়ের এই বহুত্বকে অনুভব করতে পারি কখনো কখনো।

দক্ষিণ চবিবশ পরগণার এক গ্রামে আমারে নিরলঙ্কারা স্ত্রীকে দেখে এক বৃদ্ধা বলেছিলেন, হাতে কিছু নি, কানে কিছু নি, এক টুকুন সোনাও দেয়নি বাপমা? . . . এই বৃদ্ধা মনে মনে বাস করছেন অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছোনো এক সময়কালে। আর তাই কি অপরিচিত এক মহিলাকে তিনি নিঃসংকোচে ওই প্রশ্নটি করতে পেরেছিলেন? আর একজনের কথা বলি। লোকসংগীত শিল্পী রণেণ রায়চৌধুরীর দাদা রাধিকাপ্রসাদ। তিনি এক সময় গণনাট্য সংঘে যুক্ত ছিলেন। তারপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে যান। সেখানে দীর্ঘকাল বসবাস করার পর ভায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং রণেন্দ্রনাথের পরিবারেই বাস করতে থাকেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেম, কলকাতা ভালো লাগছে? তিনি অদ্ভুত হেসে বলেন, অসুবিধা কোথায়? গোবিন্দকে তো আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি --- ভাষা এখানে এমন এক মেতে চলে গেল যাকে স্পর্শ করার সাধ্য আমার নেই। আমি কেবল চমকিত হতে পারি মাত্র। এরকম আরও অনেক গল্পই শোনানো যায়; আপাতত আর একটিই বলছি।

স্যান্ডার্সকে হত্যা করার পর ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগৎ সিং কলকাতায় এসেছিলেন ছদ্মবেশে। সেই সময় তিনি একদিন বরানগরের একটি বাড়িতে দেখা করতে যান বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এক ঋত্বিক সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথ তখন ওই বাড়িতে কিছুদিনের জন্য বাস করছিলেন। তথ্যটি আমি পাই যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী থেকে। তারপর একদিন খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হই সেই বাড়িতে; জানতে চাই, ভগৎ সিংকে সেই সময় দেখেছিলেন, এমন কেউ আছেন কি না। গৃহকর্তা দুঃখ করে জানান, তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই সময় বালক, তিনি ভগৎ সিংকে দেখেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র কয়েক মাস আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, বাবা -কাকা বা দাদার কাছ থেকে তিনি কী শুনেছিলেন- তাঁর সেই স্মৃতি থেকে কিছু বলুন। তিনি বিশেষ কিছুই বলতে পারেননি; কিন্তু লক্ষ্য করি, এক মুহূর্তের জন্য গোটা পরিবারটা যেন ভগৎ সিং-এর যুগে ফিরে গেছে। বাড়ির মহিলারাও বেরিয়ে আসেন এবং উঠোনের একটি স্থান নির্দেশ করে বলতে থাকেন, ওই ওই জায়গাটায় এস উনি দাঁড়িয়েছিলেন --- আমরা শুনেছি। আমি যা খুঁজতে গিয়েছিলাম, তা পাইনি; কিন্তু অভিযানটা তা বলে ব্যর্থ হয়েছে মনে করি না। এই কলকাতা শহরের একটি পরিবারে শহিদ ভগৎ সিং এখনও বিগ্রহ হয়ে আছেন --- এই জানাটাই বা কম কী!
১৯৭৮ -৭৯ সাল নাগাদ আমি বাংলার পটশিল্প নিয়ে কিছুটা খোঁজখবর করছিলাম। সেই সময় কালীঘাট পটুয়াপাড়ার শেষ শিল্পী বরেন্দ্রনাথ চিত্রকরের মুখে শুনি, বীণাবাদিনী, নারীর যে ছবিটা আমরা কালীঘাটের পটে দেখি, সেটা নাকি আঁকা হয়েছিল তাঁদেরই পল্লির এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে মনে রেখে। সেই মেয়েটির নাম ছিল মনোরমা। এক বাঙালি গবেষক তাকে নিয়ে পালিয়ে যান। এইরকম কোনো ঘটনার কথা আমি কোথাও পড়িনি বা শুনিনি। ঘটনাটা কতদূর সত্য, তা যাচিয়ে নেওয়ার সুযোগও আমি পাই নি। ফলে তথ্য হিসাবে তা ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু গল্পটা আমার মনে রয়েই গেছে।

পটশিল্প নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর- একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। খবর পাই, ত্রিবেণীতে এক চিত্রকর পরিবার থাকেন। সেখানে গিয়ে তাঁর সন্ধান না পেয়ে স্থানীয় লোকজনের নির্দেশে দেখা করি এক প্রবীণ মৃৎশিল্পীর সঙ্গে। তেনি জান

ান, হ্যাঁ, একঘর পোটো আগে ওদিকটায় থাকত বটে; তবে তারা বহুকাল হল চলে গেছে। এরপর তিনি আমার আ াগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন; আর শুনেই বলেন, ও আপনি পটের খোজ করছেন, এখন আর কাউকে পাবেন না; তবে ওই যে 'শিল্পী' বলে উত্তমকুমারের একটা বই হয়েছিল, ওতে অনেক কিছু আছে।

আমি সেই শিল্পীকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই। পট নিয়ে তেমন কিছু লেখা আর হয়ে ওঠেনি। লিখলেও ওই গল্পটাকে সেখানে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ থাকত না। কিন্তু গল্পটাও তো আমার এক প্রাপ্তি। 'শিল্পী' সিনেমা আমি দেখেছি ---- তার প্রথম দিকে এক চালচিত্র শিল্পীর দারিদ্রপীড়িত জীবনের কথা কিছুটা আছে। ত্রিবেণীর ওই মৃৎশিল্পীও নিশ্চয়ই ছবিটি দেছেছেন এবং তার কথা মনে রেখেছেন। যাঁদের নিয়ে ছবি করা হয়, তাঁরাও যে কখনও কখনও সেই ছবি দেখেন, তা আমি জানি। ১৯৭০ সাল নাগাদ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এক বারবণিতার কাহিনী নিয়ে একটি সিনেমা হয়েছিল 'নিশিপদ্ম' নামে। কলকাতার বারবণিতা পল্লির অনেকেই সেই ছবি দেখেছিলেন এবং দেখে অঝোরে কেঁদেছিলেন, তা আমি তাঁদের মুখেই শুনেছি। এসবই হল অভিজ্ঞতার গল্প। দমদমে এক আত্মঘাতী শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে এই গল্প শুনি তিনি তবলা বাজাতেন। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তবলার টিউশন করে কিছু টাকা রোজগার করতেন। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি একা ঘরে বসে কিছুক্ষণ তবলা বাজিয়েছিলেন; তারপর বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন অনেক রাতে। আর পরের দিন সকালে উঠোনের চালাঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহটা পাওয়া যায়।

এ গল্প লেখা যাবে না। লিখলে জোলো হয়ে যাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতালোকে এই গল্প থেকে যাবে। মাঝে মাঝে কলকাতার র াস্তায় তবলার দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মনে পড়বে। এই স্মৃতির সঙ্গে আমি বহুদিন সহবাস করব এবং ম াঝে মাঝে তা আমাকে নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যাবে অনুভূতির এক অন্য প্রদেশে। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার এক প্রান্তে এক অন্ধ ব্যক্তিকে দেখেছিলাম, বেহালায় বাজাচ্ছেন 'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে . . . . .'। সে প্রায় পচিশ বছর আগের কথা। আজও যখন রেকর্ডে গানটা শুনি, অভিজ্ঞতা আমার সামনে একটা আস্ত ছবি ধরে দেয়।

মানুষের মনের ভেতর এক অনুভূতিদেশের কল্পনা করেছিলেন জীবনানন্দ; সেখানে থেকে আলো না পেলে ভাষা হয়ে যায় 'নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল'। আমাদের মনের গহনে অনুভূতির একটা প্রদেশ আছে, আর আছে অভিজ্ঞতালোক, যার খাঁজে খাঁজে জমা হয়ে থাকে নানা বিচিত্র বর্ণ আর আকারের স্মৃতি। সেই স্মৃতি কখনও আমাদের দুঃখবেদনার কারণ হয়; কখনও বা আবার তার কাছ থেকেই আমরা পাই মনের শান্তি আর শুশ্রূষা।

বিনয় করে বলছি না, আমার অভিজ্ঞতার জগৎ সত্যিই খুব সীমিত। জন্মেছি খাস কলকাতায়। দেশটেশ কিছু নেই। গ্রাম দেখিনি ভালো করে। ভ্রমণও করা হয়নি তেমন। নিজের পরিবার আর চাকরিজগতের বাইরে আরও যে দু-এক ফালি জীবন দেখার সুযোগ পেয়েছি, তা অন্যতর কিছু কাজের সূত্রে'। সব অভিজ্ঞতার কথা একটা রচনায় কখনোই পুরো বলা যায় না। আর একটা জায়গায় এসে দাঁড়ি টানতেই হয়। আমার অভিজ্ঞতালোকের আরও দুটো বড় আখ্যানের কথা ত াই উল্লেখমাত্র করে শেষ করব এই কাহিনী।

দেশ ভাগ নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে সেইরকম কিছু মানুষের মুখের কথা শুনেছি, যাঁরা চোখের সামনে নিহত হতে দেখেছেন পিতা বা ভাই বন্ধুকে; দেখেছেন দাউদাউ আগুনে কেমন পুড়ে যাচ্ছে তাঁদের ঘরবাড়ি খেতখামার।

বয়স্ক শিক্ষার একটা কাজে যুক্ত থেকে টানা আনাই বছর আমি কলকাতার বিভিন্ন পল্লিতে বারবণিতাদের পড়িয়েছি এবং সেই সূত্রে পেয়েছি সমাজের সবচেয়ে অবমানিত এই নারীসম্প্রদায়ের জীবনদর্শনের কয়েকটি খন্ড।

এই দুই অভিজ্ঞতার কথা অন্যত্র লিখেছি। এখানে আর লিখতে চাই না, শুধু পুনক্তি পরিহার করার জন্যে নয়, এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বারবার লেখা যায় না বলে। যিনি বলছেন, তাঁর ভেতরে একটা রক্তক্ষরণ হচ্ছে --- কথায় মিশে যাচ্ছে অশ্রু আর রক্ত; আর যিনি শুনে লিখছেন, তিনিও শিহরিত হয়ে লক্ষ করছেন, লেখার কালি কখনও কখনও ঝাপসা, কখনও বা অদ্ভুত লাল হয়ে উঠছে। এইসব অভিজ্ঞতার তাই পুর্নবাচন হয় না; তাকে নিয়ে বারবার আখ্যান রচনাও করা যায় না।

একটি অভিজ্ঞতার অণুকে লেখার প্রয়োজন আমরা অনেক সময় সম্প্রসারিত করে নিই। কথক যা বলেছিলেন, সেই কথার আলাপকেই আমরা বিস্তারে নিয়ে যাই আরও নানা প্রাসঙ্গিক কথার সমাহারে --- নিজের অনুভূতি আর উপলব্ধির সঙ্গে তাকে সংমিশ্রিত করে নিয়ে। কিন্তু এমন কিছু কথাও, যাকে সম্প্রসারিত করা যায় না; নিজের থেকে একটি শব্দও আর যোগ করা যায় না। তখন এইরকম উপলব্ধি হতে থাকে যে, আর একটি শব্দ যোগ করলেই কথাটির স্বরভঙ্গ হবে। রচনা শেষ করছি এই রকম একটি অভিজ্ঞতার নির্মেদ কথাসারটুকু দিয়ে।

আমার ছাত্রী, এক বারবণিতা নারী। নিজে থেকেই তিনি একদিন বলছিলেন, এক চিলতে বারন্দা-জোড়া একটা ঘরে তিনি বৃদ্ধ মা আর মেয়েকে নিয়ে থাকেন। সন্ধ্যাবেলা 'কাস্টমার' আসার সময় --- 'মেয়েকে টিউশানি পড়তে পাঠিয়ে দি আর মাকে ধরে ধরে বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দি। কী বলব স্যার, মেয়েটা আমার মোটে পড়ে না।'
এরপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে আমি জিজ্ঞসা করি, তাঁর ছোটোবেলার দিনগুলো কেমন ছিল সেসব কথা কিছু মনে পড়ে?
জবাবে সেই নারী জানাল, 'মনে তো পড়েই। জানেন তো, আমি ছোটোবেলায় খুব দুরন্ত ছিলাম। মা আমাকে বারান্দায় বেধেঁ রেখে রান্না করত; আর মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে বলত --- ঘুমোও নি তো, খুকু?' . . .

এই বিচ্ছিন্ন কটি উক্তিকে একটা কাঠামোয় গেঁথে হয়তো গল্প লেখা যেত; কিন্তু ইচ্ছে করেনি। এই অভিজ্ঞতার কথা আমার বইতেও লিখিনি। এখন লিখতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মনে পড়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা লোকে এমন মুহূর্তে কখনও কখনও আসে, যখন সত্যিই মনে হয় --- জীবনের চিরচঞ্চল গতি থেমে গিয়ে একটি নিমেষ যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে কালের সরণিতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
১। যাঁদের সৌজন্যে এই সব কাজের সুযোগ পেয়েছি, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বারবণিতাদের শিক্ষা বিষয়ে কাজের সুযোগ দিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ। পথশিশুদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি 'উন্নয়ন' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বউবাজারের সেণ্ট জোসেফ স্কুলের 'আশীর্বাদ' শিক্ষাকেন্দ্রের সৌজন্যে। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম 'নাগরিক মঞ্চ' সংগঠনটির সঙ্গে দু-বছর যুক্ত থেকে। আদিবাসী নারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া দেন অধ্যাপিকা মিতালি রায় --- তাঁরাই গড়ে তুলেছেন শিক্ষাকেন্দ্রটি। ডা. স্মরজিৎ জানা, নব দত্ত এবং সুবেষ্ণা সিন্‌হার ,সহায়তার কথাও বিশেভাবে স্মরণ করি।
২।
পড়ে দেখতে পারেন আমার এ দুটি বই -- দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা (প্রগ্রেসিভ) এবং ব্রাত্যজীবনের বর্ণমালা(সেরিবান)

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com